বিশ শতকের বাঙালি মনীষা

এম আবদুল আলীম

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

অধ্যাপক-গবেষক
স্বরোচিষ সরকার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

মুখবন্ধ

বিশ শতকের বাঙালি জীবনে নবচিন্তার উন্মেষ ঘটে অনেক বাঙালি মনীষীর প্রত্যক্ষ প্রয়াসে। দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তার সমন্বয় সাধন করে তাঁরা সমাজ-সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব সঞ্চার করেন। ঐতিহ্য-অন্বেষণের পাশাপাশি সমকালীন জীবনাচার ও দেশ-কালকে তাঁরা গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিলো তাঁদের বাঙালিয়ানা। বিশ শতকে বাঙালিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী কয়েকজন বাঙালি মনীষীর জীবন, চিন্তা ও কর্মের স্বরূপ-অন্বেষণই এ গ্রন্থের উপজীব্য। পরবর্তী সংস্করণে এ পর্বের আরও কয়েকজন বাঙালি মনীষার কৃতি ও কীর্তিকে তুলে ধরা হবে।

ভাবুক, চিন্তাবিদ ও সৃজনশীল এই বাঙালি মনীষীদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মযহারুল ইসলাম, শামসুর রাহমান, সন্‌জীদা খাতুন, রফিকুল ইসলাম, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, আনিসুজ্জামান, হাসান আজিজুল হক, শামসুজ্জামান খান, শহীদ কাদরী, ওমর আলী, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আজাদ, হূমায়ুন আহমেদ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আহমদ রফিক প্রমুখ। লেখাগুলো *কালি ও কলম*, *সংবাদ সাময়িকী*, *বাংলাট্রিবিউন*, *কালের কণ্ঠ*, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, *ভারত বিচিত্রা*, *উত্তরাধিকার* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সাহিত্য-সংস্কৃতির কৌতূহলী পাঠকদের উপকারে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে। দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থটি প্রকাশ করায় তাম্রলিপি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি ভাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এম আবদুল আলীম
বাংলা বিভাগ
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সূচিপত্র

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : ঐতিহ্য-সন্ধানী মনীষী ১১
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : দৃঢ়চেতা বাঙালি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ২৩
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : কিংবদন্তি ফোকলোর-সাধক ৩৪
কাজী মোতাহার হোসেন : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও বিজ্ঞানচর্চার প্রাণপুরুষ ৪৬
মযহারুল ইসলাম : *মেঘবাহনের কাণ্ডারি* ৫৯
শামসুর রাহমান : জাতীয়তাবোধ ও কবিত্ব ৬৫
সন্‌জীদা খাতুন : তাঁর *জীবনবৃত্ত* ৭৮
রফিকুল ইসলাম : পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব ৮৪
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : একুশের চেতনার বাণীবাহক ৮৯
সৈয়দ শামসুল হক : শাশ্বত-বাঙালি ৯৫
শওকত আলী : প্রাকৃতজনের কথাকার ৯৮
আনিসুজ্জামান : তাঁর আকাশভরা সূর্য-তারা ১০১
হাসান আজিজুল হক : কৃতি ও কীর্তি ১১৯
শামসুজ্জামান খান : বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার দৃপ্ত পদাতিক ১২২
শহীদ কাদরী : আজন্ম বোহেমিয়ান ১৩১
ওমর আলীর কবিতা : স্টিফেন ক্রেন ও কাহলিল জিবরানের প্রভাব ১৩৬
সেলিনা হোসেন : হীরকজয়ন্তির কথকতা ১৪১
হুমায়ুন আজাদ : পাণ্ডিত্য ও মনীষা ১৪৪
হুমায়ূন আহমেদ : পাঠকনন্দিত সাহিত্যিক ১৫০
খোন্দকার আশরাফ হোসেন : কবিতার অন্তর্যামী ১৫৩
আহমদ রফিক : একুশের চেতনার অতন্দ্র প্রহরী ১৫৮
মাহবুবুল হক : মননশীল ভুবনের এক উজ্জ্বল প্রতিভূ ১৬১
মফিদুল হক : *ব্যক্তিত্ব ও বাঙালি সমাজ* ১৬৭
বিশ শতকের বাঙালি মনীষা ১৭১

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : ঐতিহ্য-সন্ধানী মনীষী

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) শেকড়-সন্ধানী গবেষক এবং ঐতিহ্য-অনুসন্ধিৎসু মনীষী। পুরনো পুথিসংগ্রহ, সম্পাদনা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সংগৃহীত পুথির সংখ্যা যেমন বিপুল তেমনি সেগুলো বিষয়বৈভব এবং সাহিত্যগুণেও সমৃদ্ধ। তাঁর সংগৃহীত পুথির সূত্রে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য সামনে এসেছে এবং তা পুনঃপাঠ এবং পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর রচনাপঞ্জি ও সংগৃহীত বিপুল পুথি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। পুথিসংগ্রহ এবং সেগুলোর বহুমাত্রিক মূল্যায়ন ছিলো তাঁর নেশা; দারিদ্র্যের কষাঘাত এবং বৈষয়িক দৈন্য কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। মধ্যযুগের নাথসাহিত্য, সুফিসাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য, মুসলিম ধর্মসাহিত্য, সওয়াল সাহিত্য, মুসলিম কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাস তাঁর সংগৃহীত পুথির আলোকেই লেখা হয়েছে। পনেরো শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর, জয়েনউদ্দীন; ষোলো শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবির, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, শা'বিরিদ খান, মুহম্মদ আকিল, হাজী মুহম্মদ নেওয়াজ, শেখ পরাণ; সতেরো শতকের কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, দোনাগাজী, আলাওল এবং আঠারো শতকের কবি মুহম্মদ ফসীহ, আলী রাজাসহ শতাধিক কবি ও তাঁদের কাব্যের সন্ধান তাঁর সংগৃহীত পুথির মাধ্যমেই পাওয়া গেছে। যেসব পণ্ডিত মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা সকলেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ঋণ অকপটে স্বীকার করেছেন। এ কাজে আকৃষ্ট হওয়া এবং নিবিষ্টচিত্ততা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন :

> অত্যল্প বয়সে (উনিশ-বিশ বৎসরের বেশি নয়) আমি মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী হই। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া–বিশেষত বাড়ীতে পূর্ব-পুরুষদের সঞ্চিত পুথি-পাণ্ডুলিপির স্তূপ দেখিয়া সেই অনুরাগ বিশেষভাবে সমুত্থিত হইয়া উঠে। নিজ বাড়ীতে ও পাড়ার প্রতিবেশীর বাড়ীতে তখন

> হরহামেশাই পুথি পড়ার মজলিশ বসিত। কিছু না বুঝিলেও সেই মজলিশে গিয়া আলাওলের পুথি পড়া শুনিতাম। শুনিয়া শুনিয়া আমার ভাবপ্রবণ কিশোর হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মিত তাহার স্মৃতি এখনও মুছিয়া যায় নাই। এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মে। তাহাই ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে আমার মনকে সাহিত্যের বিশেষত–প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ করিয়া তোলে। ... বলিতে কি, প্রাচীন পুথির সন্ধান ও আবিষ্কার আমার যেন একটা ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে। সারা জীবন আমি ধ্যান-নিমগ্ন যোগীর ন্যায় সেই ধ্যানেই কাটাইয়াছি। আমার সাধনার ফলে অসংখ্য অমূল্য পুথি ধ্বংসের করাল হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।[১]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্ম ১৮৭১ সালের ১০ই অক্টোবর; জন্মস্থান চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। যে পরিবারে তাঁর জন্ম সেই পরিবারটির ধনের প্রাচুর্য না থাকলেও ছিলো বিদ্যার গৌরব এবং বংশের আভিজাত্য।[২] তাঁর পিতা মুন্‌শী নূরউদ্দীন, মাতা মিস্‌রীজান। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতৃহারা হন এবং মাতৃহারা হন সতোরো বছর বয়সে। লালিত-পালিত হন পিতামহ মুহম্মদ নবী এবং পিতৃব্য মুন্‌শী আইনউদ্দীনের স্নেহের ছায়ায়। পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে যাতে বঞ্চিত না হন সেজন্য পিতামহ তাঁকে মাত্র এগারো বছর বয়সে বিয়ে দেন চাচাতো বোন বদিউন্‌নিসার সঙ্গে। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি পরিবারের সদস্যদের কাছে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার শুরু স্বগ্রামের সুচক্রদণ্ডী মধ্য-বাংলা স্কুলে।[৩] এরপর ভর্তি হন সুচক্রদণ্ডী মধ্য বঙ্গ-বিদ্যালয়ে। তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন এবং এ স্কুল থেকে ১৮৯৩ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ. পড়ার জন্যে ভর্তি হলেও টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পরীক্ষা দিতে পারেননি।[৪] এর ফলে তাঁর শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। তাঁর কর্মজীবন শুরু চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে। ১৮৯৫ সালে এ চাকরিতে যোগ দিয়ে অল্প কয়েকমাস কর্মরত ছিলেন। পরে প্রধান শিক্ষক

১. উদ্ধৃত, মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী (সম্পাদিত), *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা : ১৩৭৬; পৃ. ১০১

২. আহসান চৌধুরী, 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : মূল্যায়নের ভূমিকা', *সাহিত্যের রূপকার : পুনর্বিচারের অবলোকন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯; পৃ. ৬৩

৩. মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলার চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১২; পৃ. ৯৩

৪. আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, ঢাকা : ১৯৮৭; পৃ. ১৪

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি স্কুলে। এখানে প্রায় এক বছর শিক্ষকতার পর ১৮৯৬-৯৭ সালে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন চট্টগ্রামের সাব-জজ আদালত এবং পটিয়া মুন্সেফ আদালতের শিক্ষানবিশ হিসেবে। ১৮৯৮ সালে চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে কেরানি পদে চাকরি লাভ করেন। এ দায়িত্ব পালনকালে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পুথিসংগ্রহের চেষ্টার অভিযোগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চাকরিচ্যুত হন। জানা যায়, আবদুল করিম অক্ষয়চন্দ্র সরকারের *পূর্ণিমা* (মাঘ ১৩০২-অগ্রহায়ণ ১৩০৬) পত্রিকায় 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পত্রাবলী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে সেটি পড়ে মুগ্ধ হন কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের কমিশনার অফিসে কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট নিযুক্ত হলে ১৮৯৮ সালে তাঁর অফিসে আবদুল করিমকে কেরানির চাকুরি দেন। চাকরিতে নিযুক্তির কিছুদিনের মধ্যে তিনি পুথিসংগ্রহের লক্ষ্যে *জ্যোতি* পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন। এ বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা হয় এবং নবীনচন্দ্র সেনকে বদলি করা হয়।[৫] কিছুদিন বেকার জীবন-যাপনের পর আবদুল করিম চট্টগ্রামের আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কিছুদিন চাকরি করে ১৯০৬ সালে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্‌সপেক্টর অব্ স্কুলস্ অফিসের দ্বিতীয় কেরানির পদে। এখানে ২৮ বছর চাকরি করে ১৯৩৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি অবসরগ্রহণ করেন। জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব পেলেও তা গ্রহণ করেননি।[৬] বিভিন্ন সময় পেশা বদল করলেও পুথিসংগ্রহ ও সাহিত্য-সাধনা থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। অবসর জীবনে এ কাজে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পটিয়া আঞ্চলিক ঋণ সালিশি বোর্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের (১৯১৮) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কলকাতা মুসলিম সমিতির সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৫১) মূল সভাপতি এবং কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের (১৯৫২) মূল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব

৫. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭; পৃ. ৩০-৩১

৬. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

পালন করেন। *কোহিনূর*, *নবনূর*, *সওগাত* ও *সাধনা* পত্রিকার তিনি অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আবির্ভাবের কাল ছিলো বাঙালির জীবনে এক যুগান্তরের কাল। বাঙালি হিন্দুরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আশীর্বাদে এবং ইংরেজি শিক্ষার বদৌলতে জেগে উঠে তখন মুসলিস-বিদ্বেষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; রাজ্যহারা মুসলমান তখন অভিমান আর হীনম্মন্যতায় ডুবে আরব-ইরানের আলো-হাওয়ায় অতীত গৌরবের বৃথা আস্ফালনে ব্যস্ত। হিন্দুরাও জাতিগৌরব উদ্ধারে প্রাচীন আর্যাবর্তে মানস-পরিক্রম করছে। এক কথায় হিন্দু-মুসলমান তখন স্বীয় বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়ে অন্ধ আভিজাত্য এবং কৃত্রিম গৌরবের অন্বেষণে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত তখন এক ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনার যোশে নতুন স্বপ্নে বিভোর। এমন যুগ-পরিবেশ ও জীবন-বাস্তবতায় ঐতিহ্য-অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে, বাঙালিত্বের অহমিকা চিত্তে ধারণ করে এবং অসাম্প্রদায়িকতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে সাহিত্য-সেবকরূপে আবির্ভূত হন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ এক গাঁয়ে। তবে গ্রামীণ সংকীর্ণতা; যেমন–ধনগর্ব, জনগর্ব, বংশ-গৌরব, মানলিপ্সা, পরশ্রী-কাতরতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা, প্রতিশোধ-বাঞ্ছা; এসব থেকে তিনি আবাল্য মুক্ত ছিলেন। উদারচিত্ত ও মানবিক বোধ ছিলো তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গৃহকর্মীকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে রাখতেন সুসম্পর্ক। শিশুদের স্নেহ করতেন, অন্যের দুঃখে হতেন কাতর। সাম্প্রদায়িক পরিবেশে জন্মেও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। দেশবিভাগের পরেও পরিবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাকিস্তানি ভাবধারা তথা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। ভারত-পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং গৃহহারা ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ তাঁকে মর্মযাতনা দিয়েছে। বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি নয়, চিত্তশুদ্ধিতে ছিলেন তৎপর। স্বজাতির ঐতিহ্য-অন্বেষণে সদা মশগুল থাকতেন। কোনো প্রলোভনের কাছে মাথানত করেননি। আদর্শ শিক্ষক, কর্তব্যনিষ্ঠ কেরানি, দুর্লভ মানবিক গুণ এবং সংস্কৃতিমান মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সংস্কারের দাসত্ব করেননি; বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুথিসাহিত্যের কারবারি হলেও রুচি ও মনন গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক জীবনদৃষ্টি দ্বারা। সবসময় পঠন-পাঠনে মগ্ন থাকতেন। সমকালীন প্রায় সকল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাঁর মতো সুরুচির সাধক সকল যুগেই বিরল। শিথিল-চরিত্র, বিকৃতবুদ্ধি, তরল রুচিসম্পন্ন, চাটুকার আকীর্ণ এই রুগ্নদেশে আবদুল করিম

সাহিত্যবিশারদের মতো খাঁটি মানুষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য উদ্ধার এবং রক্ষায় অত্যাবশ্যক।[৭]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বহু পুরনো পুথিসংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় কবিদের কবিত্ব ও কাব্যসম্ভার সামনে এনেছেন। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই এ কাজে প্রেরণা লাভ করেন। তাঁদের পরিবারে প্রাচীন পুথির কিছু সংগ্রহ ছিল। অল্প বয়সে এগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়েই তিনি পুরনো বাংলা সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন।[৮] পুথির সন্ধানে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে; বৃহত্তর চট্টগ্রাম তাঁর পুথিসংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হলেও ত্রিপুরা, রংপুর, নোয়াখালী, পাবনা, বাখেরগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে পুথিসংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত পুথির সংখ্যা হাজারখানেক।[৯] ব্যক্তি উদ্‌যোগে বাংলা পুথিসংগ্রহের ইতিহাসে নগেন্দ্রনাথ বসুর পরেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম স্মরণীয়।[১০] ১৯৫০ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুরোধে তিনি ৫৯৭ খানা বাংলা, ফারসি ও উর্দু পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ শরীফ ৪৫০খানার মতো পুথি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে প্রদান করেন।[১১] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত পুথির পরিচয় তিনি নিজেই সম্পন্ন করেছিলেন, যা অধিকাংশই *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। সেগুলো বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে *প্রাচীন পুথির পরিচয়* নামে দু খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। এতে ছয়-শ পুথির পরিচয় স্থান পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ড. আহমদ শরীফের সম্পাদনায় ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করে *পুথি-পরিচিতি*।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত পুথি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করেছে। জীবদ্দশায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে তাঁর সম্পাদনায় নয়টি পুথি প্রকাশিত হয়; সেগুলো হলো–নরত্তম ঠাকুরের *রাধিকার মানভঙ্গ* (১৯০১), কবিবল্লভের *সত্যনারায়ণের পুথি* (১৯১৫), দ্বিজ রতিদেবের *মৃগলুব্ধ* (১৯১৫), দ্বিজমাধবের *গঙ্গামঙ্গল* (১৯১৬), আলী রাজার

৭. আহমদ শরীফ, 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : কৃতি ও জীবনদৃষ্টি', *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী সংস্করণ, ২০১৭; পৃ. ৬৩-৬৫

৮. আনিসুজ্জামান, 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ', *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি-সাধক*, ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ২০১৩; পৃ. ৭৩

৯. আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, ঢাকা : ১৩৯৩; পৃ.৪৪

১০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১১. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

জ্ঞানসাগর (১৯১৭), বাসুদেব ঘোষের *শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস* (১৯১৭), মুক্তারাম সেনের *সারদামঙ্গল* (১৯১৭) এবং শেখ ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়* (১৯১৭)। মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে তাঁর যৌথ নামে প্রকাশিত *আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৩৫) গ্রন্থটির উপাদান-উপকরণ সবই তাঁর সংগৃহীত। ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সমিতি প্রকাশ করে তাঁর সম্পাদিত আলাওলের *পদ্মাবতী*র খণ্ডিত অংশ। পুথিসংগ্রহের পাশাপাশি সম্পাদনায় যে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলার বিদ্বৎসমাজে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত প্রথম পুথি নরোত্তম ঠাকুরের *রাধিকার মানভঙ্গ* সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন :

> তিনি (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ) এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় যে, যেন কোন জর্মান এডিটর এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন।[১২]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অনেক কবির পুথিসংগ্রহ করলেও বেশি অনুরাগী ছিলেন মহাকবি আলাওলের প্রতি। এই কবির রচিত *পদ্মাবতী*, *সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল*, *সেকান্দারনামা* এবং *সপ্তপয়কর*ের মোট ৭৭ খানা পুথিসংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলাওল সম্পর্কে লিখেছেন প্রায় পঞ্চাশটি প্রবন্ধ।

পুথিসংগ্রহ তাঁর নেশা হলেও আগ্রহ ছিলো সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে। পল্লি-বাংলার নির্মল প্রকৃতি ও লোকজীবনের নিরাভরণ রূপের মধ্যে কেটেছে তাঁর জীবন। ফলে লোকসাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং সেগুলো তিনি সংগ্রহ করেন। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর পঁচিশটির মতো প্রবন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'চট্টগ্রামের ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রকাশিত হয় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩০৯)। তিনি লোকসংগীত, ছড়া, ধাঁধা, মেয়েলিগীত প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। ফোকলোরের গুরুত্ব অনুধাবন করে লিখেছিলেন :

> বঙ্গের বিশাল প্রাচীন সাহিত্য কেবল হস্তলিখিত পুথিরাজিতেই সীমাবদ্ধ নহে। লিখিত সাহিত্যের বাহিরেও এমন সকল জিনিস আছে যে, তাহাদের রক্ষণ

১২. উদ্ধৃত, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদিত), *নির্বাচিত রচনা : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৪০০; পৃ. ২৫৩

এবং উদ্ধার নানা কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সে সকল জিনিস কাগজের মত জড়পদার্থে নিহিত না হইয়া প্রায়ই লোকের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে এবং ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বলিয়াছি ত প্রাচীনের অঙ্গীভূত অতি তুচ্ছ পদার্থও আমাদের আদরের অনুপযুক্ত নহে। নিম্নে সেইরূপ কয়েকটি জিনিষের নাম প্রদান করিতেছি :–

মৌখিক প্রাচীন গীত, ২. ছড়া ও বারমাস্যা, ৩. হেঁয়ালী বা ধাঁধা, ৪. প্রবচন, ৫. প্রবাদ, ৬. ব্রতকথা, ৭. উপকথা, ৮. ডাক ও খনার বচন, ৯. পালা, ১০. রহস্য-কথন, ১১. নীতি-কবিতা, ১২. সারি-গান, ইত্যাদি।[১৩]

ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিলো প্রবল। তাঁর ৪৩১টি প্রবন্ধের মধ্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি বিষয়ক প্রবন্ধ পাওয়া গেছে পঞ্চাশের অধিক। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নগরী চট্টগ্রাম ছিলো তাঁর অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু। এ নগরীর ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তাঁর অনুসন্ধিৎসায় নবমূল্যায়িত হয়েছে। চট্টগ্রাম নগরীকে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন *ইসলামাবাদ* গ্রন্থ। অনেক গবেষক তাঁকে 'বাঙালি মুসলমানসমাজে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ' বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি ছিলেন একজন উদার, অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ। বাঙালিত্ব ছিলো তাঁর অহংকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অনুভব করেছেন আত্মিক টান ও গভীর মমত্ব। তিনি মাতৃভাষা, বাঙালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি এবং সাধারণ মানুষের সৃজনশীলতার স্তরটিকে সুবিন্যস্ত করে তুলে ধরেন।[১৪] ভারতের সাধারণ ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, 'বাংলা ভাষা ত্যাগ করিলে বঙ্গীয় মুসলমানের কোনো মঙ্গল আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। যদি কখনো অধঃপতিত বাঙালির উদ্বোধন হয়, তবে বাংলার অমৃতনিষ্যন্দিনী ও অনলগর্ভা উদ্দীপনাতেই হইবে।'[১৫] তিনি মনে করেন, মুসলমানেরা যে দেশ থেকেই বঙ্গদেশে আসুক-না-কেন, এখানে তাঁরা বাঙালি জীবনের সঙ্গে একাত্ম্য হয়ে খাঁটি বাঙালি হয়ে গেছে। মুসলমানদের ওপর উর্দুভাষা আরোপ করা তাদের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। তিনি জোর

১৩. আবদুল করিম, 'বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য', *প্রকৃতি*, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃ. ১৪৮

১৪. শামসুজ্জামান খান, 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ঐতিহ্য-সাধনা', *বাঙালির বহুত্ববাদী লোকমনীষা*, ঢাকা : চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৬; পৃ. ১১০

১৫. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য', *নবনূর*, আষাঢ় ১৩১০